SEMESTER-3
PAPER:CC-7
MODULE-3
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একরাত্রি গল্প:

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সাধনা পত্রিকায় একরাত্রি গল্পটা প্রকাশিত হয়। একটি লিরিকধর্মি- গল্প। ছোটগল্প যে কখনো কখনো কবিতার ব্যঞ্জনায় শাশ্বত এর উপলব্ধি জাগায় তারি প্রমাণ এই গল্পটি। এই গল্পের নায়ক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার একরাত্রির স্মৃতি নিয়ে মহৎ প্রাপ্তির আনন্দে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। উত্তম পুরুষের বাচন ভঙ্গিতে সমস্ত গল্পটি বলা হয়েছে। এই গল্পে প্রেম বিরহ মধুর।

গল্পের প্রথম অংশে এক যুবকের স্বেচ্ছাকৃত আত্ম বঞ্চনা ও তার পরিণামে আত্মগ্লানি সূচক প্রতিক্রিয়া এবং সর্বশেষে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে গল্পটি আদ্য মধ্য অন্তযুক্ত এক কাহিনী। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে এবং একটা বহু আকাঙ্খিত মুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্তে পরিণতি গল্পটির সর্বপ্রধান উপাদান।

সুরবালা নায়কের নর্ম সহচরী। অভিভাবকদের প্রশ্রয়ে নায়কের মনে সুরবালার উপর একটা অধিকারবোধ অতি শৈশবে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু নায়কের ধ্রুবতারা তাদের গ্রামের নীলরতন- যে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখে কালেক্টর সাহেবের নাজির হয়েছে। সে নাজির হতে না পারলেও জজ আদালতের হেডক্লার্ক তো হতে পারবে। সুতরাং গ্রাম ছেড়ে পিতা-মাতাকে ছেড়ে সর্বোপরি সুরবলার প্রভাবের গণ্ডি অতিক্রম করে তরুণ নায়ক কলকাতায় এসে উপস্থিত হল এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার বৃহৎ পরিসরে নায়কের দৃষ্টিভঙ্গি গেল বদলে। জীবনের ধ্রুবতারার আসন থেকে কালেক্টারের নাজির নীলরতন পদচ্যুত হলো। তাদের জীবন ও দর্শন অনুসরণ করে দেশ সেবায় মনোনিবেশ এবং নেতাদের কথা মত চাঁদার খাতা হাতে দরজায় দরজায় উপস্থিতি জোর কদমে শুরু হল।

নায়কের বয়স যখন ১৮ তখন উভয়পক্ষের অভিভাবকেরা একমত হয়ে সুরবালার সঙ্গে নায়কের বিবাহ স্থির করে খবর পাঠালেন। কিন্তু নায়ক অসম্মত হলো কারণ নায়ক যখন দেশের সেবায় চাঁদা সংগ্রহের ব্যস্ত তখন বিবাহের কথা সে ভাবতেই পারে না। ফলে সুরবালা রামলোচনের সঙ্গে জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। খবর যথা সময়ে নায়কের কাছে পৌঁছল কিন্তু নায়ক অন্তরের কোন তাগিদ অনুভব করলেন না। এরপর নায়কের জীবনের নেমে এলো অন্ধকার।। পিতার মৃত্যুতে লেখাপড়া সাঙ্গ হল ।স্বপ্নের ফানুস চুপসে বাস্তবে যে নগ্ন মূর্তির সামনে বেসামাল নায়ক, শেষ পর্যন্ত মফঃস্বলের একটা ছোট স্কুলে

সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি পেল। দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন তখনও বিলীন হয়নি। ভেবেছিল নিজের দেশের জন্য আত্ম বলিদান বাস্তবায়িত না হলেও উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়ে এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক একটি সেনাপতি গড়ে তুলবে।। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষার চাপ ,গ্রামার, অ্যালজেব্রার কঠিন মীমাংসা , হেডমাস্টার মহাশয়ের কঠোর দৃষ্টি নায়কের দেশ সেবার স্বপ্ন উৎসাহকে নিস্তেজ করে দিল। এ পর্যন্ত গল্পটির কাহিনী প্রচলিত পথ ধরে এগিয়েছে। শৈশব স্মৃতি ভারে নায়কের মন এ পর্যন্ত কোনোভাবেই কাতর নয়। স্বপ্নভঙ্গের হতাশার মধ্যে সুরবালা একবারও উঁকি মারেনি। নায়কের কাছে সুরবালার বিষয় যেন নিহাতই একটা ক্লোজড চ্যাপ্টার। সুরবালা তার স্বামী উকিল রাম লোচন বাবুর সঙ্গে এখানেই থাকে এ কথা জানা স সত্ত্বেও তার সুরবালা সম্পর্কে কোন ভাবনাচিন্তার উদ্রেক হয়নি।

কিন্তু নায়কের মনে এই সুরবালা মৃত নয় ভয়ংকর রূপে জীবিত। গল্পের পরবর্তী অংশের এটাই মুখ্য উপাদান। গল্পটি যে মনস্তত্ত্বের প্রধান এই অংশেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিন নিজস্ব কাজে নায়ক রাম লোচন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যায়। পাশের ঘরে চুরির টুং টাং আওয়াজ, শাড়ির খসখস শব্দ এবং মৃদু পদধ্বনির মধ্য দিয়ে অতি অতর্কিতে নায়কের মনের ক্যানভাসে উঠে আসে সুরবালার সেই সরলতা ,বিশ্বাস এবং শৈশব প্রীতিতে ভরা সেই চোখের চাহনি। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরে এসে স্থির হয়ে বসে নায়ক ভাবতে থাকে তার মন হঠাৎ সুরবালার জন্য এত উতলা হচ্ছে কেন? নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে নিজেই বলে সুরবালা আমার কে?

নিজের মন থেকেই উত্তর আসে :

"সুরবালা আজ তোমার কেহই নয় কিন্তু সুরবালা তোমার কি না হইতে পারি তো"।

মধ্য যৌবনের নিঃসঙ্গতায় সেই শৈশব স্মৃতি মগ্ন চৈতন্যের ওপার থেকে আবার ফিরে এলো। এর থেকে যেন নায়কের মুক্তি নেই। মুক্তি হতোই না যদি না বিভীষিকাময়ী মৃত্যু প্লাবন তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতো।

গল্পের শেষ পর্যায়ে নায়কের এই ব্যর্থ জীবনের হতাশা আক্ষেপ অনুশোচনা সব অন্তর্হিত হয়েছে ।গল্পটি এক বিশেষ রাত্রির নির্দিষ্ট মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন সোমবার সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রকৃতি যত ভয়ংকর হতে লাগলো অস্থির ব্যাকুল চ্িত্ত নায়কের মনে পড়তে লাগলো এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। রাত যখন একটা দেড়টা তখন হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল। ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের অতি তুচ্ছ জীবনে প্রলয় কাল রাত্রির নিঃশব্দ ভীষণ ভয়ংকর অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্যু স্রোতের চরম মুহুর্তে এনে দিল পরম সার্থকতা। সমস্ত গল্পটি যেন একটি বিশেষ রাত্রির এই বিশেষ

মুহূর্ত গড়ে তোলার জন্য অপেক্ষা করছিল।শৈশবের বাল্য সঙ্গিনী সুরবালা নায়কের জীবনে একবারই শেষবারের মতো একাকিনী এত কাছে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিক যখন জলমগ্ন কেবল হাত পাঁচ ছয় দূরের দ্বীপের ওপর নায়ক ও সুরবালা দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য।। প্রকৃতির এই বিরাটত্ব ভয়ংকর সুন্দর রূপ নায়কের মনে জাগিয়েছে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ। বাল্য সখী সুরবালা ও নায়ক সেসময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে হৃদয় দিয়ে ছুঁতে চেয়েছে বলেই তারা একটি কথাও বলেনি।

তবে তাদের মধ্যে ছিল অন্ধকারের প্রাচীর। এই মৃত্যুরূপী মহাপ্রলয়ের মধ্যে জীবনের শাশ্বত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নায়ক উপস্থিত হয়েছে চৈতন্যের শীর্ষ সীমায়। কেবল আর একটা ঢেউ আসলেই পৃথিবীর প্রান্ত থেকে বিচ্ছেদের বৃন্তটুকু থেকে খসে এরা দুজনে এক হয়ে যাবে। এই ঢেউ কি মৃত্যুর অপর এক নাম! জীবজগতের অপর প্রান্তে যে অনন্ত জীবন, মৃত্যু তার অতন্দ্র প্রহরী, আসলে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় প্রেম চির অম্লান অনন্ত প্রেম। বাসনার আগুনে তা দগ্ধ নয়। এই দুটি নরনারী যখন চির মিলনের প্রান্তরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন নায়ক স্থির অমলিন মাধুর্য নিয়ে বলতে পেরেছে :

"সে ঢেউ না আসুক। স্বামী পুত্র গৃহ ধনজন লইয়া সুরবালা চিরকাল সুখে থাকুক"।

এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে নায়ক অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। আর সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটা অনন্ত রাত্রির উদয় হয়েছিল ।আর এই একটিমাত্র রাত্রি তার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা। অন্তরে জাগলো শাশ্বতর উপলব্ধি। এই উপলব্ধি বাকি জীবন তার প্রেরণা হয়ে রইল। এই একটা রাত্রি দেহ তৃষ্ণার অতিথি কামনা বাসনার সীমিত গন্ডির বাইরে আপাতদৃষ্টিতে কিছু না পাওয়ার বেদনার ঊর্ধ্বে সব পাওয়ার এক অনির্বাচনীয় আনন্দে নায়কের শুন্য ভান্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাসের অমিত রায়ের অনুভূতি। যেখানে লাবণ্য সঙ্গে তার প্রেম প্লেটনিক লাভে পরিণত হয়েছে। একরাত্রি গল্পটা পাঠের শেষে মনে অনুরণিত হতে থাকে লিরিকের সুর ও মূর্ছনা, শেষ এগারোটা অনুচ্ছেদ জুড়ে প্রকৃতি ও জীবনের মেলবন্ধনে এক প্রলয় রাত্রির পরিবেশে অমৃত আস্বাদ এর আনন্দ উচ্চারিত হয়েছে।। উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় ক্ষণকাল রূপান্তরিত হয়েছে চিরকালে। এখানে একরাত্রি নামকরণটাও সার্থক হয়ে উঠেছে। সুরবালা কি আর তার হারাবার কোন ভয় নেই কারণ সে জায়গা করে নিয়েছে তার মনের গভীরে স্মৃতির পাতায়। মন যখন এমন পূর্ণতায় সমৃদ্ধ হয় তখন সমাজ-সংসার জীবনের কলরব সব মিথ্যে হয়ে যায়।। সেকেন্ড মাস্টার এর জীবনের তুচ্ছ তা ব্যর্থতাবোধ সবকিছু ছাপিয়ে গল্পের পরিণামে এক নিঃশব্দ অখন্ড অনন্ত উপলব্ধি জাগিয়েছে। রাত্রি শেষ হয়ে এলে ঝড় থেমে গেলে জল নেমে যায় সুরবালা কোন কথা না বলে বাড়ি চলে

যায় এবং নায়কও তার ঘরে চলে যায়।। এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে যে অনন্তের আশ্বাদ নায়ক লাভ করেছে সেটাই হয়ে উঠেছে নায়কের জীবনের অমৃত।

সুরবালা নায়কের পরশপাথর। গল্পের শেষে নায়ক কে বলতে শুনি "আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রি আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"মহাপ্রলয় কালীন মৃত্যুর ভয়াল রূপের মধ্যে নায়ক প্রত্যক্ষ করল অনন্ত জীবন রহস্যকে। সুরবালা পরস্ত্রী কিন্তু সুরবালার অনন্ত জীবন সে তো তারই। সুখে থাক সুরবালা স্বামী পত্র নিয়ে। খুজার পালা শেষ এবার শুধু অপেক্ষার পালা ,স্মৃতিকে লালন করার পালা। আর এই অনুভূতির মধ্যে একরাত্রি গল্পটা অসাধারণ সার্থকতা মন্ডিত হয়ে উঠেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. রবীন্দ্র সমগ্র: বিশ্বভারতী সংস্করণ নানাবিধ খন্ড।

২. রবীন্দ্রনাথ। শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।এমুখার্জি অ্যান্ড কো্ প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ।২০০০।

৩. রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য। বুদ্ধদেব বসু। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।কলকাতা ।১৯৮৩।

৪. রবীন্দ্র জীবন কথা। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। কলকাতা। আনন্দ। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৫. কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প। জ্যোতির্ময় ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং।কলকাতা।২০ ০০।

৬. রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ । তপোব্রত ঘোষ দে'জপাবলিশিং।কলকাতা।২০০৩।

৭. **কালের পুত্তলিকা** বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর।১৮৯১-২০০।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।দে'জপাবলিশিং।কলকাতা।